দেখার যত উপায়

boobook

দেখার যত উপায়

বিবিসি টেলিভিশন প্রযোজনা 'ওয়েজ অফ সিয়িং' এর ভিত্তিতে

জন বার্জার

boobook

অনুবাদ

শামসুদ্দিন চৌধুরী

নোভেল্টা

প্রকাশক
নোকতা
কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল মার্কেট
নীলক্ষেত, ঢাকা–১২০৫

✆ +৮৮ ০১৯১৯ ২৭ ৬৪ ৫৮

facebook.com/noktaarts

noktaarts.com
dak@noktaarts.com

পরিবেশক
সংহতি প্রকাশন, ১২৯ কনকর্ড এম্পোরিয়াম, কাঁটাবন, ঢাকা

অনলাইন বিক্রয় সংস্থা
rokomari.co m

কলকাতা বিক্রয় কেন্দ্র
ফটোপিয়ার, ১৩/১/বি ব্রাইট স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০১৭
✆ +৯১ ০৩৩ ২২৮১ ০৭৯২

ISBN 978-984-33-7078- 5

on photography translation of susan sontag's
on photography, by mahmudul hossain
published by nokta, january 2013, dhaka, bangladesh

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই
বইয়ের কোন অংশেরই কোনরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না।
এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রথম নোকতা সংস্করণ
মাঘ ১৪১৯, জানুয়ারি ২০১৩

প্রথম পেঙ্গুইন প্রকাশ
হেমন্ত ১৯৭৭

প্রচ্ছদের প্রতিকৃতি
শিশির ভট্টাচার্য

গ্রন্থস্বত্ব
অনুবাদ © মাহমুদুল হোসেন

টাইপোগ্রাফি
মিতু হক

অক্ষর বিন্যাস
আবু নওশের

প্রাক-মুদ্রণ
প্রিন্টেক সল্যুশন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
প্রগ্রেসিভ প্রিন্টার্স প্রাঃ লিঃ

পাঠকের মূল্য
তিনশত ষাট টাকা

boobook

অনুবাদকের কথা

জন বার্জার ও তাঁর সহযোগীদের সৃষ্টি 'ওয়েজ অফ সিয়িং' এর চল্লিশ বছর পূর্তি আমাকে এর অনুবাদে উদ্বুদ্ধ করেছে।

একই নামের টেলিভিশন সিরিজটি তার টেক্সট এর তুলনায় কিছুটা স্বতন্ত্র। চার পর্বের এই চলচ্চিত্রে প্রথম অংশের শিরোনাম ছিল 'মনস্তাত্ত্বিক বিবেচনা', দ্বিতীয় অংশে 'শিল্পে নারী', তৃতীয় অংশে 'শিল্পসংগ্রাহক ও শিল্পসংগ্রহ' এবং চতুর্থ হলো 'বিজ্ঞাপনে শিল্প'। ভিডিও ফরম্যাটের চলচ্চিত্রটির সঙ্গে গ্রন্থের পাঠের পার্থক্য রয়েছে। চলনশীল ইমেজের পরিবর্তে এখানে তিনটি চিত্রগত প্রবন্ধ যুক্ত হয়েছে। পাঠ্যটিকে টেলিভিশন সিরিজটির উৎস হিসেবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে টেলিভিশন সিরিজটি ১৯৭০র দশকে নির্মিত হয়েছে। এখনও এর পটভূমি ও পাত্রপাত্রী প্রাসঙ্গিক বক্তব্য ধারণ করে।

চলচ্চিত্রটির প্রদর্শনে বা পাঠে যেসব প্রসঙ্গ সম্পর্কে কৌতূহল জাগতে পারে 'দেখার যত উপায়' পাঠের ভূমিকা অংশে সে সবের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অনিবার্যভাবেই কোথাও কোথাও পুনরুক্তি ঘটে গেছে।

রচনাটির প্রথম উদ্ভব ঘটে এর চিত্রনাট্য অনুসারে যা পরে গ্রন্থাকারে রূপ নেয়। ফলে চিত্রনাট্যসুলভ সিকোয়েন্স পরিবর্তন হওয়ার লক্ষণ এর টেক্সট এর মধ্যে বর্তমান রয়েছে। এই সূত্রে টেক্সট-এর মধ্যে স্পেস ও ইন্টেন্ট এর নিশানা অনুসরণ করতে পাঠককে অনুরোধ করছি। স্তবকমধ্যে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার নির্দেশক রূপে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পরিমাণে ফাঁকা জায়গা রাখা হয়েছে।

বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে জন বার্জারের মূল গ্রন্থের অনুসরণে গ্রন্থবদ্ধ পাঠটি বিন্যস্ত হয়েছে। ব্যবহৃত পরিভাষা সমূহকে অধ্যায়ের শুরুতে ক্রম অনুসারে তৃতীয় বন্ধনির মধ্যে এবং গ্রন্থের শেষে বর্ণানুক্রমিকভাবে দেওয়া রয়েছে।

অনুসন্ধিৎসু পাঠক-দর্শকের কাজে আসলে এই অনুবাদকে সার্থক মনে করব।

শামসুদ্দিন চৌধুরী

২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২০
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

boighar boighar.com

‘দেখার যত উপায়’ পাঠের ভূমিকা: অনুবাদকের ভাষ্য

boobook

‘আমরা যাইনি মরে আজও, তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়।’
— জীবনানন্দ দাশ

দেখার কথা

মানুষের দেখার প্রক্রিয়া তার কথার চেয়ে বহুগুণ বেশি সক্রিয়, তার চেয়ে আগে আগে চলে। মানুষকে তার পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজে পেতে সমর্থ করে তারই দৃষ্টিরিন্দ্রিয়। সেই পরিবেশকে বর্ণনা করতে কথার প্রয়োজন হয়; কিন্তু যা দেখা যায় তার কতটুকু আর শব্দের আঁচড়ে ফোটানো যায়। বরং দেখে দেখে চারপাশ সম্পর্কে যে প্রতীতি গড়ে ওঠে তা উচ্চারিত সংলাপের চেয়ে অনেকখানি ভিন্ন। দেখা আর কথা’র মাঝে যে প্রভেদ নিয়ত বিরাজ করছে বার্জার তার উপযুক্ত রেপ্রিজেন্টেশন খুঁজে পান পরাবাস্তববাদী চিত্রকর রেনে মাগরিৎ এর চিত্র ‘দ্য কী অফ ড্রিমস’-এ।

মাগরিৎ এর চিত্রকর্মটি হলো চারপাল্লার একটি জানলা; যার কালো রঙের পশ্চাদপট রয়েছে ও প্রত্যেক অংশে একটা করে সাদা ইমেজ, সাদা অক্ষরে যার যার নিচে শিরোনাম রয়েছে। কেউ সহজেই এই ইমেজ ও এর শিরোনামের মাঝে সম্পর্ক অনুমান করে নিতে পারে। আর এর একটা অংশে স্যুটকেসের ইমেজের নিচে সৈনিকদের কিটব্যাগ বলে উল্লেখ রয়েছে। একটা ঘোড়ার মস্তকের ইমেজের নিচে লেখা রয়েছে দরজা, ঘড়ির ইমেজের নিচে বাতাস এবং কলসের নিচে পাখি—যা এর থেকে চিত্রটির শিরোনামের প্রসঙ্গে কোনো কিছু বোঝায় না। বরং চিত্রটি দর্শকের সামনে এর লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে ঠিক বার্তাটি পৌঁছে দেয়।

করে নেই। আর তা নির্ধারিত হয় সেসবের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের নিরিখে; দৃষ্টি দিয়েই আমরা চারপাশের দৃশ্যজগতের প্রয়োজনীয় অংশ সম্পর্কে উপলব্ধি করি; মনের মধ্যে দৃশ্যময়তার একটা অবিকল কল্পবাস্তবকে গড়ে নেই। এই দেখা ও দ্রষ্টব্য হওয়া এক উভমুখী প্রক্রিয়া; দৃশ্যজগতের মধ্যে অন্য দৃষ্টিগোচর বস্তুর ন্যায় দৃষ্টিপাতকারীও রয়েছে। কেউ নিজে যেমন দর্শক একাধারে কারও নিকটে সে দ্রষ্টব্য হতে পারে। আর কে কীভাবে দেখছে মানুষের সংলাপ তাকেই কথায় সাজিয়ে রূপ দিতে চায়। অল্প কথায় সেই দেখা হতে পারে ইমেজ, বা রূপকল্প, কী দৃশ্যকল্প; যে নামেই ডাকা হোক। আমরা 'ইমেজ' পরিভাষাটি ব্যবহার করব।

তবে দেখার ক্ষেত্রে কী ঘটে থাকে? বিশেষত তা যখন মনোদৈহিক এক বিষয়। যখন কোনো কিছুর প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাতে যে দৃশ্যটি দেখতে পাই; দৃষ্টি বন্ধ করলেও তা চেতনায় থেকে যায়। দ্রষ্টব্য চোখের আড়াল হয়ে গেলেও, ক্ষণিকের জন্য হলেও, তার অস্তিত্ব থাকে; আমাদের দেহের ইন্দ্রিয়গুলো তাদের উপলব্ধ যাবতীয় কিছুকে মস্তিষ্কের ভেতরকার অনুভূতি ও স্মরণশক্তির স্থল থেকে পরিচালনা করে; সেখানে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মূল্যায়ন করে; এই অনুভূতি মধ্যস্থতাকারী হিসেবে সেই সঞ্চালনের কাজ করে; তা আবার বস্তুর বাইরের রূপের দ্বারা সঞ্চালিত হয়। বাইরের জগত পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সঞ্চালিত হয়; আর মানুষের আত্মা অর্থে সাধারণ ইন্দ্রিয়ের(বোধশক্তির) সঙ্গে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দৌত্য করে অনুভূতি। তার স্মরণশক্তির উপর সাধারণ ইন্দ্রিয় তার ছাপ ফেলে; গুরুত্ব অনুসারে স্মরণশক্তি তাকে রক্ষা করে। মানুষের সব ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষুই সবচেয়ে দ্রুত কাজ করে; যার দ্বারা বস্তুর দশটি লক্ষণ সম্বন্ধে সে জ্ঞাত হতে পারে: আলো ও অন্ধকার, বর্ণ বা রঙ, ঘনত্ব বা দার্ঢ্য, আকৃতি ও অবস্থান, দূরত্ব ও নৈকট্য, গতি ও নিশ্চলতা। ইমেজ এ সমস্তকেই ধারণ করে।

boobook

ইমেজ কাকে বলে? একবার দৃষ্টি ফেরালেও যখন দৃশ্যটি মুছে যায় না, এভাবে কল্পিত বা গঠিত কোনো মূর্তি বা প্রতিমূর্তিকে ইমেজ বলে। হয় তা বাস্তবে ছিল বা তাকে কোনো কিছুর প্রতিস্থাপনের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে; মানুষের বোধি থেকে এমন মূর্তি বা প্রতিমূর্তি সৃষ্ট হলে তাকে ইমেজ বলে।

ইমেজ হলো তাই যাকে একবার কেউ দেখেছিল; সেখান থেকে ও সেই সময় থেকে তাকে সরিয়ে এনে নতুন করে সৃষ্টি বা পুনরায় অবিকলভাবে উৎপাদন করা হয়েছে। হতে পারে তা নদীর ঢেউ, পাখির উড্ডয়ন, হরিণের ছুটে চলা, বা প্রাণান্তক ভূমিকায় কোনো শিকারী; সেই দৃশ্যটি ক্ষণিকের জন্য কারো কাছে দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। তবে দৃষ্টিপাতকারী কোন অবস্থায় দেখছে তার উপর ইমেজ নির্ভর করে। যে গুণীন তুকতাক করার জন্য আদিম শিকারের পশুটিকে দেখছে তার ইমেজ, ঐ আদিম সমাজের নতুন বয়োপ্রাপ্ত সদস্যটির দেখার মত হবে না। শিকার করা পশুকে ঘিরে থাকা মানুষের দেখা প্রকৃতই স্বতন্ত্র হবে।

এই ইমেজ পুরাকালের বিশ্বস্ত দলিল হিসেবে হাজির হয়ে আমাদেরকে চমকে দেয়; কোনো কালে কেউ একজন কীভাবে কোনো কিছুকে দেখেছে তার অকাট্য প্রমাণ হলো সে।

এদিকে মানুষ তার বোধির বিকাশে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। সভ্যতার সব যুগেই সাংস্কৃতিক বস্তু নির্মিত হত। সমকালীন দর্শক ও স্রষ্টার কাছে তার একরকম অর্থ ছিল; পরের যুগের মানুষ তাকে যেভাবে দেখেছে তাদেরও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে। ফলে 'শিল্প' অভিধাটিকে ঘিরে কতক প্রত্যাশা সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেগুলোকে মানুষ আয়ত্ত করে। সেসব তার চৈতন্যকে নির্মাণ করে। আজকের যুগে মানুষ যখন এই ইমেজকেই শিল্পকর্ম হিসেবে মূল্যায়ন করে, সে লক্ষ্যে কোনো কিছুকে দেখে; তখন এই অর্জিত জ্ঞানকে অতীতের শিল্পের উপর প্রক্ষেপ ঘটানোর ফলে ইমেজটিকে ঘিরে এক ধরনের জ্যোতির্মণ্ডল গড়ে ওঠে; এক রহস্যময়তা তাকে আচ্ছন্ন করে। এই রহস্যমণ্ডিতকরণ বর্তমানের কোনো এক সামাজিক শ্রেণীর স্বার্থকে রক্ষা করে। ফলে শিল্পকর্মটির সঙ্গে দর্শকের দূরায়ণ ঘটে যায়। তাতে করে কার্যকর সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তাকে ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হই।

এভাবে বার্জার মূলত দেখার মনস্তাত্ত্বিক দিককে বিশ্লেষণ করেছেন; তাতে যাবতীয় ভিস্যুয়ালকে দেখার অনিবার্য ফল হিসেবে ইমেজে পর্যবসিত হতে দেন। ইমেজ হিসেবেই একসময় যার যাত্রা শুরু হয়েছিল, ক্রমাগত ব্যক্তির চৈতন্যের প্রসার ঘটার ফলে তাতে বাড়তি অর্থ যুক্ত হলো। ফলে কারো একজন শিল্পীর নির্দিষ্ট দেখা বা ভিশন হিসেবে তা পরিচিতি পায়। ইমেজের মত এত ভাল করে অতীতের দুনিয়াটাকে আর কেউ তুলে ধরতে পারে না। কিন্তু অতীতের এসব ইমেজকে যখন শিল্প অভিধা দেওয়া হল সঙ্গে মানুষের শিক্ষা, দীক্ষা, সামাজিকীকরণের ফলে অর্জিত সৌন্দর্য, সত্য, আকার প্রভৃতি তাকে আচ্ছন্ন করে দিল। ব্যক্তি মানুষের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার ইতিহাস অনুধাবনও পাল্টে যায়। ফলে সাংস্কৃতিক রহস্যমণ্ডিতকরণ এসব ইমেজকে আরো দূরের করে তুলল। যার জন্য ইতিহাস থেকে সিদ্ধান্ত নেবার পরিসরও কমে গেল।

boobook

যদিও অতীতের এমন রহস্যমণ্ডিতকরণ থেকে মুক্ত থাকা আদৌ শক্ত নয়; বরং তা অনেকটাই সুলভ ও অনায়াসে আয়ত্তসম্ভব হয়ে উঠেছে। প্রথমে তা ঘটায় পরিপ্রেক্ষিতের প্রয়োগ; প্রাচীন গুহাচিত্রের পর গ্রিক শিল্পের ক্ষেত্রে চিত্রকলার যে বিকাশ ঘটে তা সাময়িক বিস্মৃত হলেও রেনেশাঁসে এসে পুনরুজ্জীবিত হয়। গ্রিকে 'অপসিস্' বলতে দৃশ্যবস্তু বোঝাত; সেই থেকে অপটিক্স এসেছে। দৃষ্টি থেকে নিঃসৃত রেখার জ্যামিতি হিসেবে গড়ে উঠল পরিপ্রেক্ষিত বা পার্সপেক্টিভ। অর্থাৎ চোখ থেকে বস্তু যত দূরে যাবে তত ছোট দেখাবে; এই দূরে সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর রং-ও বদলে যেতে থাকে। এবং দূরে সরার সঙ্গে সঙ্গে বস্তুও অস্পষ্ট হতে থাকে। এক কথায় বলা চলে, চোখের ক্রিয়ার সম্যক জ্ঞান হলো পরিপ্রেক্ষিত; চোখের সামনে যত বস্তু উপস্থাপিত পিরামিডের ধরনে তাদের আকার ও বর্ণ রয়েছে, তা অনুধাবন করতে হবে। এই জ্যামিতির জ্ঞান মানুষের দেখার উপায় বদলে দিল।

ইমেজ, আলোকচিত্র ও পুনরুৎপাদন

এক সময় রহস্যমণ্ডিতকরণ থেকে মুক্তির আরো বড় একটা পর্ব দেখা গেল। বার্জার ধাপে ধাপে একে ব্যাখ্যা করেন। প্রথমে ঘটল আলোকচিত্রের আবিষ্কার। এর আগে রেনেশাঁসের যুগ থেকে শিল্প একক দর্শকের অভিমুখে মিলিত হওয়া পরিপ্রেক্ষিতের

প্রয়োগ ঘটাল; আগে যে এক সময়ে একটি স্থানেই থাকতে পারত। তার ইশারা হলো ইমেজকে সময়ের পরিসরে বাঁধা চলে না। ফটোগ্রাফি, বিশেষ করে মুভি ক্যামেরা একে পাল্টে দিল। মুহূর্তের অ্যাপিয়ারেন্স গুলোকে ক্যামেরাবন্দি করায় যা দেখা হচ্ছে তা সময় ও পরিসর অনুসারে দর্শকের স্থানের উপর নির্ভরশীল হয়ে দাঁড়াল। ফলে শিল্পীদের দেখার উপায়টাও বদলে দিল। আলোর পরিবর্তনে বস্তুর অ্যাপিয়ারেন্স বা দৃষ্টিগোচরতাও পাল্টে যায়, ইমপ্রেশনিস্টরা সেভাবেই দেখল। কিউবিস্টরাও কেবল একটা সুবিধাজনক অবস্থান থেকে কোনো মুখমণ্ডলকে আঁকল না, নাক যদি এক কোণ থেকে তারা দেখে তবে চোখজোড়া দেখল আরেক কোণ থেকে।

ক্যামেরার উদ্ভাবনের সাথে সাথে বোঝা গেল, এই দেখার বিষয়ে দৃষ্টিপাতকারী কখন কোথায় রয়েছে সেই পরিসরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। তাই কোনো ইমেজ আর আগের মত এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকল না। রেনেশাসের পরিপ্রেক্ষিতের অনুসারে পূর্বের দৃষ্টিপাতকারীর একক অক্ষির ধারণা ক্যামেরার মুভমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে গেল। আগের মত দেখার একক অবস্থান ত্যাগ করে মানুষ প্রয়োজনমত সঞ্চারী দৃষ্টিকোণের প্রয়োগ করল। চিত্রকলার ক্ষেত্রেও তা প্রতিফলিত হলো।

পুনরুৎপাদনের মাধ্যমে একমাত্রিক দৃষ্টিকোণের এই অবসান না ঘটে বরং আরও বিপুল বিস্ফারে এসে হাজির হলো। আগে স্থির অনড় অবস্থায় চিত্রকর্মগুলো ছিল ইমারত বা প্রাসাদের অংশ; তখন তার অধিকার ন্যস্ত ছিল মুষ্টিমেয়ের হাতে। কিন্তু যেই ক্যামেরা তার ইমেজগুলোকে পুনরুৎপাদন করল; যান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের সূত্র ধরে তা মুদ্রণ, টেলিভিশনের মাধ্যমে বিশ্ব জুড়ে সঞ্চালিত হলো; তাতে এর এককত্ব মুছে গিয়ে মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনের আবহের মধ্যে অযুত সহস্র প্রতিলিপি হয়ে ঢুকে পড়ল। ছবিগুলোকে ঘিরে থাকা 'অরা' বা জ্যোতির্মণ্ডলের অবসান ঘটল; এমনকি কোনো জাদুঘরের সীমানায়ও না থেকে প্রাচীরহীন জাদুঘরের ন্যায় চিত্রগুলো নতুন নতুন অর্থে ব্যবহার-উপযোগী ইমেজে পরিণত হলো। তাতে চিত্রটি যেমন কারো একক মালিকানায় আটকে রইল না; তেমনি স্থিরনির্দিষ্ট একটি মাত্র অর্থের তুলনায় এর বহু বৈচিত্র্য সাধিত হলো; এখন যে যেভাবে এই অর্থকে সঞ্চালন করে সেভাবেই এর প্রয়োগ করা সম্ভবপর হলো। পুনরুৎপাদিত ইমেজ মূল অর্থকে সরিয়ে রেখেই যৌক্তিক যে কোনো বক্তব্যের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হতে সমর্থ হয়। চলচ্চিত্রে হরহামেশাই তা ঘটছে। এমনকি চিত্রকর্মেও শিরোনাম হিসেবে কথার প্রয়োগ দ্বারাও ইমেজের অর্থ পাল্টে ফেলা চলে।

এই যান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের ফলেই শিল্পের বিচিত্র, বহুধা প্রয়োগ করা সম্ভবপর হয়েছে। আর তার ফলে শিল্পের ক্ষেত্রে কারো কার্যকর একক কর্তৃত্ব, বা দখলদারিও নষ্ট হয়েছে। কোনো পবিত্র অরা বা বাতাবরণে শিল্পকে মুড়ে রাখার অবসান ঘটল। ফলে এই মহার্ঘ ইমেজগুলো সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আয়ত্তে এসে গেল; এ হয়ে উঠলো এক মহান ভাষা। কে কীভাবে এই ভাষাকে তাদের রাজনৈতিক প্রয়োগের জন্য ব্যবহার করছে, এর মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে অতীতের এই সম্পদের মাঝে স্থাপিত করে।

এর ফলে আরো বড় রকমের একটা পরিবর্তন ঘটল। চিত্রটি তখন আর কোথাও দালানে

boobook boobook

প্রথম অধ্যায়

[ওয়ে: **উপায়**; সিয়িং: **দেখা**; ওয়েজ অফ সিয়িং: **দেখার উপায়**; প্রেজেন্স: **উপস্থিতি**; পার্সেপশন: **উপলব্ধি**; অ্যাপ্রিসিয়েশন: **মূল্যায়ন**; অ্যাজাম্পশন: **পূর্বধারণা**; মিস্টিফাই: **রহস্যমণ্ডিত**; মিস্টিফিকেশন: **রহস্যমণ্ডিতকরণ**; ফর্ম: **আকার**; পার্সপেক্টিভ: **পরিপ্রেক্ষিত**; ডিপ্রাইভেশন: **বঞ্চিতকরণ**; সেডাকশন: **প্রলুব্ধকরণ**; মুভমেন্ট: **চলাচল**; ভিজিবল: **দৃশ্যমান**; রিপ্রোডাকশন: **পুনরুৎপাদন**; অ্যাপিয়ারেন্স: **দৃষ্টিগোচরতা**; পিক্টরিয়াল: **চিত্রগত**; মেটাফর: **উৎপ্রেক্ষা**; হিউম্যান কন্ডিশন: **মানব-পরিস্থিতি**; রিজেন্ট: **অন্তর্বর্তীকালীন শাসক**; রিজেন্টনেস: **অন্তর্বর্তীকালীন শাসকত্ব**; ভ্যানিশিং পয়েন্ট: **অদৃশ্যবিন্দু**;]

১

কথার আগে দেখা আসে। শিশু বলতে শেখার পূর্বে দেখতে ও চিনতে শেখে।

boobook

আরেকভাবেও কথার আগে দেখা চলে আসে। তা হলো দেখার মাধ্যমেই চারপাশের জগতের মধ্যে আমাদের স্থান প্রতিষ্ঠা হয়; চারপাশের জগতকে শব্দের সাহায্যে ব্যাখ্যা করি বটে, কিন্তু একই সঙ্গে আমরা যে সেই জগতের দ্বারা বেষ্টিত হয়েও রয়েছি, শব্দেরা এই সত্যকে বাতিল করতে পারে না। যা কিছু দেখতে পাই ও যা কিছু জানি তার মধ্যেকার সম্পর্ক কখনও স্থির নয়। সন্ধ্যা নামলেই সূর্য অস্ত যায়। এ কথা সবাই জানি, পৃথিবী সূর্যের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তবু এই জ্ঞান, এই ব্যাখ্যা, কখনই সূর্যাস্তের দৃশ্যের সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খায় না। কথা ও দেখার মধ্যে এই যে সদা বিরাজমান ফারাক রয়েছে; তা নিয়ে পরাবাস্তববাদী চিত্রকর মাগরিৎ তাঁর **'দ্য কী অফ ড্রিমস'** নামের চিত্রকর্মটিতে[৩] মন্তব্য করেছেন।

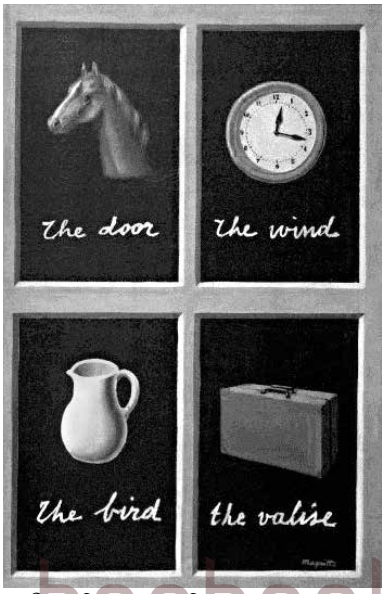

দ্য কী অফ ড্রিমস: রেনে মাগরিৎ, ১৮৯৮–১৯৬৭

boobook

কোনো বস্তুকে আমরা যেভাবে দেখে থাকি, সেই দেখার প্রক্রিয়া প্রভাবিত হয় আমরা যা যা জানি ও যা কিছু বিশ্বাস করি তার দ্বারা। মধ্যযুগে মানুষ যখন নরকের অস্তিত্বে আস্থাশীল ছিল, তখন আগুনের দৃশ্যরাজি তার কাছে যা বোঝাত তা নিশ্চিতই আজকের মানুষের উপলব্ধির চেয়ে অনেকখানি ভিন্ন। নরক সম্বন্ধে তাদের ধারণার অনেকখানিই আগুনের প্রজ্জ্বলন ও নির্বাপন শেষে ভস্মে পরিণত হওয়ার কাছে ঋণী ও আগুনে দগ্ধ হবার বাস্তব অভিজ্ঞতাও যার সাথে যুক্ত হয়েছে।

যখন কেউ প্রেমে পড়ে, দয়িতের দর্শনে প্রেমিকের মধ্যে যে পূর্ণতার অনুভব হয়, তা আর কোনো কথা, কোনো আলিঙ্গনের তুল্য হতে পারে না: ঐ পূর্ণতার বোধকে একমাত্র মানবযুগলের প্রেম নিবেদনের মধ্য দিয়ে সাময়িকভাবে ধারণ করা সম্ভবপর হতে পারে।

তবু এই যে কথার আগে আগে অবলোকন প্রক্রিয়াটি আসে, আর তা কখনই পুরোপুরি কথার দ্বারা ঢাকা পড়ে না; তা নিছক কোনো উদ্দীপকের প্রতি যান্ত্রিক সাড়াপ্রদান নয়। (মানুষের এই অবলোকন পদ্ধতির যেটুকু চোখের অক্ষিগোলকের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যদি কেউ সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশকে আলাদা করতে পারে—একে তখনই কেবল এভাবে ভাবা যেতে পারে।) আমরা কেবল তাই দেখি ঠিক যার দিকে তাকাই। কোনো কিছুতে তাকানোতেও এক ধরনের নির্বাচন কাজ করে। এই কাজের ফলে, যা কিছু দেখি তাকে আমাদের নাগালের মধ্যেই পাই—তা স্পর্শযোগ্য নিকট দূরত্বে না হোক। কোনো কিছুকে

স্পর্শ করা হলো এর সাথে নিজের সম্পর্ক স্থাপন করা। (একটা বন্ধ ঘরের মধ্যে চোখ বন্ধ করে চারদিকে পাক খান তবে সহজেই লক্ষ্য করবেন যে, হাতড়ে হাতড়ে কোনো কিছুকে স্পর্শ করা কী ভাবে দৃষ্টির এক স্থিতিশীল, সীমাবদ্ধ আকারের মতো হয়ে ওঠে)। তবে আমরা কখনোই একটিমাত্র বস্তুর দিকে তাকাই না; বরং সব সময়ই বস্তুপুঞ্জ ও আমাদের মধ্যের সম্পর্কের দিকে নজর দেই। আমাদের দৃষ্টি সব সময়ই সক্রিয় রয়েছে, ক্রমাগত সঞ্চরমান, অবিরত নিজের চারদিকের বস্তুসমূহকে বৃত্তাকারে ধারণ করে চলছে, আমরা যেভাবে আছি, দৃষ্টি অবিকল আমাদের মতো করে তা গঠন করে।

এছাড়া যখনই কোনো একটা কিছুকে দেখতে পাই, সাথে সাথে এই বোধ ফিরে আসে যে এভাবে অপর কেউ আমাদেরকেও দেখতে পারে। আমরাও যে এই দৃশ্যমান জগতের অংশ, অপরের দৃষ্টির সঙ্গে আমাদের দৃষ্টি সমন্বিত হয়ে তাকে পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে।

যদি মেনে নেই, ঐ পাহাড়টিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাহলে বলা যায় ঐ পাহাড় থেকেও আমাদেরকে দেখা যাবে। মানুষের উচ্চারিত সংলাপের চেয়েও তার দৃষ্টির উভয়মুখী বৈশিষ্ট্য হলো অধিকতর মৌলিক লক্ষণ। সংলাপ প্রায়শই হয় এক বাচিকীকৃত করার প্রয়াস—যে প্রয়াসে ব্যাখ্যা করবে কীভাবে রূপক বা আক্ষরিক স্তরে 'আপনি বস্তুকে দেখছেন'; আর 'সে কীভাবে বস্তুকে দেখছে' তা আবিষ্কারের এক উদ্যোগ।

'ইমেজ'[৪] শব্দটি এই গ্রন্থে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে সকল ইমেজই মানুষের সৃজন।

boobook

তবু যখন কোনো একটা ইমেজ একক শিল্পকর্মরূপে উপস্থাপিত হয়, তখন যেভাবে লোকে একে বিবেচনা করে তাতে শিল্প বিষয়ে অধ্যয়নকৃত পূর্বধারণার পুরো সিরিজে প্রভাব কাজ করে। এই পূর্ব অর্জিত ধারণাগুলো হলো:

সৌন্দর্য
সত্য
প্রতিভা
সভ্যতা
আকার
মর্যাদা
রুচি, প্রভৃতি।

আবার এসব শেখা অনুমান বা পূর্বধারণার অনেকগুলোই বাস্তব জগত যেভাবে রয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় (বাস্তব জগত তাতে শুদ্ধ বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের চেয়ে কিছু বেশি, অর্থাৎ চৈতন্যও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)। বর্তমানের সঙ্গে বিচারে সত্য হতে গিয়ে দর্শকের এসব অনুমান অতীতকে আবিষ্ট করে ফেলে। ফলে সেসব কোনো কিছুর ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনার চেয়ে তাকে আরো রহস্যমণ্ডিত করে তোলে। অতীত কখনোই যেখানে আবিষ্কারের জন্য অপেক্ষমান নয়, আসলেই তা কী ঠিকভাবে শনাক্ত হবার জন্য। ইতিহাস সবসময় বর্তমান ও তার অতীতের মধ্যেকার সম্পর্ককে নির্মাণ করে। পরিণামে বর্তমানের শঙ্কা অতীতের রহস্যমণ্ডিতকরণের দিকে নিয়ে যায়। অতীতকে আমাদের প্রয়োজন তার মধ্যে বাস করার জন্য নয়; বরং এ হলো আমাদের জন্যে সিদ্ধান্তের আধার, করণীয় নির্ধারণের জন্য যা থেকে আমরা আহরণ করে থাকি। ফলে কোনোভাবে অতীতের সাংস্কৃতিক রহস্যমণ্ডিতকরণ ঘটলে তা দ্বিগুণ ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে। তাতে করে শিল্পকর্মটি অহেতুকই দূরের বস্তু হয়ে পড়ে। এবং তখন অতীত ক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হবার আরো কমসংখ্যক উপসংহারকে আমাদের সামনে তুলে ধরে।[৯]

আমরা যখন কোনো ল্যান্ডস্কেপকে 'দেখি', নিজেদেরকে তার মধ্যে স্থাপন করা অবস্থায় দেখতে পাই। আর যদি অতীতের কোনো শিল্পকে 'দেখি', তখন নিজেদেরকে ইতিহাসের মধ্যে স্থিত করি। আর যখন তা দেখা থেকে বিরত রাখা হয়, তখন ঐ ইতিহাস থেকে আমরা বঞ্চিত হই যা আমাদেরই অধিগত ছিল। এই বঞ্চিতকরণের[১০] ফলে লাভবান হয় কে? শেষ পর্যন্ত, অতীতের শিল্পটি একরকম রহস্যমণ্ডিত হয়ে পড়ে; কারণ তখন সংখ্যালঘু সুবিধাভোগী এক গোষ্ঠী পেছনে তাকিয়ে এমন এক ইতিহাসকে আবিষ্কারে তৎপর হয় যা শাসক শ্রেণীর স্বার্থকে যথার্থতা দিতে পারে; এবং আধুনিক অভিধার বিচারে এ ধরনের যথার্থতা কোনো অর্থই বহন করে না। এবং, অবধারিতভাবে রহস্যের জন্ম দেয়।

পৌঁছানো—গবেষণাটিতে এমনতরো অভিধার প্রয়োগের ফলে জীবন্ত অভিজ্ঞতার পর্যায়ের ইমেজের উশকানো আবেগ স্থানান্তরিত হয়, সেই নিরাসক্ত 'শিল্প মূল্যায়নে'র ক্ষেত্রে। ফলে যত দ্বন্দ্ব সমস্তই হারিয়ে যায়। কেবল অপরিবর্তনীয় 'মানবীয় পরিস্থিতি' সহ একটি দ্বন্দ্ব থাকে, এবং এক চমৎকার তৈরি-বস্তু হিসেবে চিত্রকর্মটি বিবেচিত হয়।

হ্যালস অথবা অন্তর্বর্তীকালীন শাসকদের যারা তাকে চিত্রকর নিযুক্ত করেন তাদের সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। উভয়ের মধ্যে যে ঠিক কী সম্পর্ক ছিল তার পরিস্থিতিগত প্রমাণ উপস্থিত করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের কাছে চিত্রকর্মের নিজের সাক্ষ্য রয়েছে: একদল পুরুষ ও একদল নারীকে অপর একজন পুরুষের দেখার সাক্ষ্য, যে হলো চিত্রকর নিজে। এই প্রমাণকে পর্যবেক্ষণ করুন ও আপনার নিজের জন্য মূল্যায়ন তৈরি করুন।

শিল্পের ইতিহাসবেত্তা [গবেষকের] এ ধরনের প্রত্যক্ষ বিচার থেকে শঙ্কা পোষণ করেন:

> হ্যালসের অন্যান্য চিত্রকর্মের ন্যায়, এর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বৈশিষ্ট্য আমাদেরকে এমন বিশ্বাসে প্রলুব্ধ করে যেন আমরা প্রতিকৃতিকৃত নারী ও পুরুষের ব্যক্তিত্বসূচক বৈশিষ্ট্য ও এমনকি অভ্যাস পর্যন্ত জানি।

কী এই 'প্রলুব্ধকরণ' যার সম্পর্কে এ কথা লিখিত হয়েছে? চিত্রকর্মটি আমাদের উপরে যে ক্রিয়া করে তা এর চেয়ে কম কিছু নয়। সেসব আমাদের উপর কার্যকর হতে পারে, কারণ হ্যালস তার চিত্রে আসীন ব্যক্তিদেরকে যেভাবে দেখেছেন আমরা তা মেনে নেই। তবে নির্বিচারে তার দেখার সাথে একমতও হই না। একে ঠিক ততখানিই গ্রহণ